দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 30 NOV 1986
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

ঢাকাঃ রোববার, ১৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৯৩

শিক্ষা বিস্তারে হাজী মুহাম্মদ মোহসীনের গৌরবময় ভূমিকা

30 NOV 1986

আহমাদ সালিম

দানবীর হাজী মুহাম্মদ মোহসীন (১৭৩০-১৮১২) অবিভক্ত ভারতের ইতিহাসে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল নাম। দুঃখী ও অসহায় মানুষের বন্ধু হিসেবে হাজী মোহসীন ছিলেন অনন্য। তাঁর কাহিনী কিংবদন্তীরূপে আজো বাংলার ঘরে ঘরে ফিরছে। কিন্তু আমরা তাঁর ঘটনাবহুল বিচিত্র জীবনের কিয়দংশের ইতিহাসও ভালো করে জানি না। আমরা জানি তিনি চোরকে সাজা না দিয়ে প্রচুর টাকা-পয়সা দিয়ে চুরি না করার উপদেশ দিয়েছিলেন। জানি না, হাজী মুহাম্মদ মোহসীনের দান করা অর্থেই বাংলাদেশের মুসলমানদের তথা বাংলার শিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হয়েছিল।

মোহসীনের পূর্ব পুরুষরা ছিলেন পারস্যের (ইরানের) অধিবাসী। তাঁরা প্রথমে মুর্শিদাবাদে বসবাস করতেন পরে তাঁর পিতা আগা ফয়জুল্লাহ হুগলী নগরীতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি এই হুগলী নগরীতেই জন্মগ্রহণ করেন (১৭৩০ খ্রীঃ)। তিনি এখানেই শিক্ষা লাভ করেন এবং যৌবনে দেশ ভ্রমণে বের হন। তাঁর বড় বোন মমুজান ছিলেন নিঃসন্তান। মমুজানের স্বামী মির্জা সালাহউদ্দীন ছিলেন চব্বিশপরগনার জমিদার। স্বামীর মৃত্যুর পর সেই জমিদারীর মালিক হন বেগম মমুজান। তখনও মোহসীন বাইরে। তবে, ইতিমধ্যে তিনি পবিত্র হজ্জ সমাপন করে হাজী হয়েছেন। বোনের খবর পেয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। অনেক বদলে গেছে হুগলী। যাই হোক, তবু তিনি ফিরে এসে বোনের জমিদারী দেখা-শোনায় সহযোগিতা করতে থাকেন। এদিকে বোন মমুজান ভাই হাজী মোহসীনকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি তাঁর নামে উইল করে দিয়ে ইন্তেকাল করেন। মোহসীন ছিলেন বৈষয়িক ব্যাপারে উদাসীন। আজীবন অবিবাহিত এক সাধক পুরুষ। তাঁর কাছে জমিদারীর চেয়ে মানব-সেবাই বড় মনে হয়েছে। তাই হাজী মোহসীন এই বিপুল সম্পত্তির অর্থ দিয়ে গরীব-দুঃখীদের দুঃখ মোচনের চেষ্টায় ব্রতী হন এবং মৃত্যুর পূর্বে (১৮০৬), এক দানপত্রে সমুদয় সম্পত্তি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন ও অন্যান্য জনহিতকর কাজের জন্য দিয়ে যান। তখন বাংলাদেশের মুসলমানদের জ্ঞান চর্চার হার ছিল একেবারেই কম। তাছাড়া, এই উপমহাদেশে তখনও শিক্ষার ঢেউ লাগেনি। হাজী মোহসীনের কৃপায় কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাত্র গড়ে উঠেছিল। তখন জমিদারীর আয়ের বিরাট এক অংক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, শিক্ষকদের বেতন এবং গরীব মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি প্রদানে ব্যয় করা হতো। তাই হাজী মুহাম্মদ মোহসীনকে বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় প্রবাদ পুরুষ বলা যায়।

হাজী মোহসীনের মৃত্যুর পর উইল নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হলে বৃটিশ সরকারের গভর্নর জেনারেল লর্ড মেটকাফ উক্ত উইলে কিছুটা রদবদল করেন এবং ১৮৩৬ সালে মোহসীন শিক্ষা তহবিল গঠন করেন।

ফলে, এই শিক্ষা তহবিলের টাকা দিয়ে অবিভক্ত বাংলার শিক্ষা দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে। বিশেষ করে এই উপমহাদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। দেখা যায়, এই উইলে দেয়া জমিদারীর অর্থ দিয়েই লর্ড মেটকাফ ১৮৩৬ সালে কলকাতার বাইরে হুগলী শহরে হাজী মোহসীনের জন্মস্থানে প্রথম হুগলী ইংলিশ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

স্মরণযোগ্য যে, এ বছরেই লর্ড ম্যাকেলে বৃদেশে ইংরেজী শিক্ষা নামে আজকের বিতর্কিত স্যাকুলার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য সুপারিশ করেছিলেন। সে যাই হোক, মুসলমান ছেলেরা তখন ইংরেজী শিক্ষার প্রতি দারুণভাবে উদাসীন ছিল। ফলে, মোহসীন শিক্ষা তহবিল-এর টাকা দিয়ে পরিচালিত হুগলী কলেজ দ্বারা হিন্দু সমাজই উপকৃত হয়েছিল বেশী। কারণ, হুগলী কলেজের অধিকাংশ ছাত্রই ছিল হিন্দু। অবশ্য, এর অনেক পরে ১৮৭৩ সালে এদেশের মুসলমান নেতৃবৃন্দের সম্মিলিত প্রতিবাদের মুখে বৃটিশ সরকার উক্ত কলেজে মোহসীন তহবিলের গ্র্যান্ট বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন।

ঐতিহাসিক তথ্যাদি প্রমাণ করে যে, ১৮৩৬ থেকে ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত হুগলী কলেজ উইল করা সম্পত্তির অর্থ দিয়েই পরিচালিত হয়েছিল। এতে বছরে প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার টাকা মোহসীন তহবিল থেকে খরচ হয়ে যেতো। দেখা যায়, শিক্ষকদের বেতন থেকে শুরু করে ছাত্রদের ভাতা, ঘর ভাড়া, লাইব্রেরীর পুস্তক ক্রয় প্রভৃতির সমুদয় অর্থ উক্ত ফাণ্ড থেকেই ব্যয় করা হতো।

এমনকি বোন মমুজানের ব্যবহৃত আসবাবপত্র থেকে ইমাম বাড়ীর আসবাবপত্র পর্যন্ত সমুদয় কিছুই হুগলী কলেজে শিক্ষার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। তাই জোর দিয়েই বলা যায়, অবিভক্ত বাংলার শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশের মুসলমানদের উইলের উপরই আজকের উন্নত ভারতকে নির্ভর করতে হয়েছিল এবং তা ছিল হাজী মুহাম্মদ মোহসীনের অবদান। কেননা,

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 30 NOV 1986
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

ইংরেজী শিক্ষার প্রাথমিক যুগে হুগলী কলেজের ছাত্ররা পরবর্তীতে উচ্চশিক্ষা লাভ করে চাকরি, সাহিত্য, সমাজসেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রভূত সুফল ও সুনাম লাভ করেছিল। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাদেরই একজন ছিলেন। তাছাড়া তিনিই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট ছিলেন। এতে মুসলমানদের বোধোদয় হয়। তারা সচেতন হয়ে ওঠেন।

তাই উনিশ শতকের শেষ ভাগে এসে মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটা প্রাণচাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়। তারা মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন এবং এ ব্যাপারে তৎকালীন বৃটিশ সরকারের সাথে কয়েক দফা বৈঠকও করেন। ফলে, সরকার একটি পৃথক মোহামেডান এডুকেশন ইনডাওমেন্ট কমিটি গঠন করতে বাধ্য হন। এই কমিটির সদস্য ছিলেন সর্বজনাব আমির আলী, নবাব আব্দুল লতিফ খান বাহাদুর, আব্দুল জব্বার ও নবাব মীর মুহাম্মদ আলী প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দ। এই কমিটি গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল মোহসীন শিক্ষা তহবিল-এর টাকা যেন মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তার ও ধর্মীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার কাজেই যথাযথ ব্যয় হয়। কেননা, অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্য আর সৌর্যে-বীর্যে উন্নত মুসলিম জনগোষ্ঠীকে কোণঠাসা করার জন্য এমনিতেই হিন্দু নেতৃবৃন্দ ছিল সব সময় এক পা এগিয়ে। তাই তারা কখনোই চাই তো না যে, শিক্ষায়-দীক্ষায় মুসলমানরা অগ্রগতি লাভ করুক। কিন্তু বৃটিশ গভর্নর জেনারেল ছিলেন শিক্ষানুরাগী। তাই তিনি শিক্ষা বিস্তারে এগিয়ে এলেন। তিনি দেখলেন এক দানবীর প্রচুর অর্থ রেখে গেছেন মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য। আর উইলের শর্তানুযায়ী এটা মুসলিম জনগোষ্ঠীর কল্যাণেই ব্যবহৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তারা চাইলো, সরকারী বিদ্যালয়গুলোতে যেন ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি মুসলমানদের জন্য পার্থিব শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়।

তাছাড়া, এমন একটা শিক্ষানীতির সম্ভাব্যতা নিয়েও তারা চিন্তা করলেন যে, ইংরেজী শিক্ষার পাশাপাশি যাতে মুসলমানরা তাঁদের ধর্মীয় শিক্ষা আরবী, ফারসী, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারে। কিন্তু অবিভক্ত ভারতের হিন্দু নেতৃবৃন্দের ক্রমাগত ষড়যন্ত্রের ফলে এই মহান শিক্ষানীতি আর কোনদিনই বাস্তবায়িত হয়নি। বরং কলকাতা মাদ্রাসা এক সময় কলকাতা কলেজে রূপান্তরিত হয়েছিল। তারা বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে এটাই বুঝাতে সক্ষম হয়েছিল যে, এরা হল ক্ষমতাচ্যুত মোগলদের অনুসারী। এদের রক্তে রাজা হওয়ার বাসনা। এদের সুযোগ দিলেই আবার সংগঠিত হবে, হৃতরাজ্য ফিরে পাবার চেষ্টা করবে।

চলবে